# সিরাজউদ্দৌলা দিবস

**সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন**

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ষড়যন্ত্র এবং চরম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে পরাজিত এবং নিহত হয়েছিলেন, একথা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাও কোনদিন অস্বীকার করেননি। তবে, ষড়যন্ত্রের সময় সিরাজউদ্দৌলার ব্যক্তিগত এবং স্বেচ্ছাচারিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত অপবাদ প্রচারিত হয়, সেগুলি অপনোদন হতে সময় লেগেছে। চল্লিশের দশকে আমি যখন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনা করি, তখন একবার ছাত্ররা সিরাজউদ্দৌলা দিবস উদযাপন করেছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, সে সভায়ও অপবাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়। বক্তারা বলেন যে, সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বাংলার স্বাধীনতার শেষ প্রতীক। হলওয়েল মনুমেন্ট নির্মাণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাঁর বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, ছোট একটি কামরায় কতকগুলি নারী-পুরুষকে আবদ্ধ রেখে তাঁদের অনেকের মৃত্যু ঘটানোর মত অমানবিক বর্বরতা সিরাজউদ্দৌলা অনুষ্ঠিত করেছিলেন বলে যে অভিযোগ তা একেবারেই অলীক। কলকাতার মুসলমান ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত সরকার Black Hole Tragedy বা অন্ধকূপ হত্যার নিদর্শনটি সরিয়ে নিতে বাধ্য হন।

বাংলার বিশেষ করে কলতাকার মুসলমান ছাত্র যারা চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তারা পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে লুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধারের আন্দোলন হিসাবে ঐ আন্দোলনকে চিহ্নিত করে। যদিও কোন কোন হিন্দু পুনর্জাগরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দেখেছেন সবাই তা করেননি। একদিকে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ শাসনের ঘটনাকে নতুন জীবনের উন্মেষ হিসাবে দেখলেও কবি নবীন চন্দ্র সেনের মত ব্যক্তিও ছিলেন যাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সিরাজের পরাজয়ের অর্থ ছিল স্বাধীনতা লুপ্তি। জনসাধারণ অবশ্য এ বিষয়ে কখনও ভুল করেনি। মীরজাফর-যিনি ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক তাঁর নাম এবং বিশ্বাসঘাতক এ দুটো কথা বাংলা ভাষায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে-১৯৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকে। এমনকি যারা সিরাজউদ্দৌলার পতন নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে তারাও যে কৌশলে মীরজাফর এবং তার অনুচরেরা এই বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন তার প্রশংসা করতে সাহস পায়নি বিশ্বাসঘাতকরা। বিশ্বাসঘাতকরা তাকে নানাভাবে রঞ্জিত করলেও সেটা বিশ্বাসঘাতকতাই থেকে যায়।

সিরাজউদ্দৌলা তার আমলের বিশ্বসঘাতকতার সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধের অভাব। এ অভিযোগ হয়ত সর্বতোভাবে সঠিক নয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মীরজাফর, জগৎশেঠ জানতেন যে, তাঁদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ হবে না। সে যুগে খবরের কাগজ এবং রেডিও ছিল না। লোকে মনে করত, দেশরক্ষার ভার শাসনকর্তাদের উপর। শাসনকর্তাদের দ্বন্দ্বকে তারা উপরওয়ালাদের দ্বন্দ্ব হিসাবে উড়িয়ে দিত। তবে, প্রতিবাদের অভাবের আর একটা কারণ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব। সিরাজউদ্দৌলার কয়েক শতাব্দী আগের একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাংলার সনাতনী যুগের প্রারম্ভে যখন একবার বিশ্বাসঘাতকেরা কৌশলে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করেছিল তখন সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় নূর কুতুবে আলম নামক একজন বিখ্যাত আলেমের হস্তক্ষেপের ফলে। বলা প্রায় নিষ্প্রয়োজন যে, নূর কুতুবে আলমের মত ব্যক্তিত্ব তখন যদি অনুপস্থিত থাকতো বাংলার ইতিহাস তখন অনেক আগেই বদলে যেত। হয়তো এটা সিরাজউদ্দৌলার দুর্ভাগ্য যে, তিনি তেমন কোন ব্যক্তির সমর্থন পাননি বা পাবার সুযোগ পাননি।

বিশ্বাসঘাতকতা অবশ্য যে-কোন যুগে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। জনসাধারণ শিক্ষিত এবং আত্মসচেতন হলেই যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে সাহস পাবে না তা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালে নাৎসী জার্মানী যখন নরওয়ের উপর আক্রমণ

করে কুইজলিং নামক এক নরওয়ে জিয়ানও হিটলারকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কুইজলিং শব্দটি এমন মীরজাফরের মত বিশ্বাসঘাতকদের সমার্থক। কুইজলিং কোন ব্যক্তির নাম-এ কথাও অনেকে ভুলে গেছে। তবে, কুইজলিং মীরজাফরের মত তার মসনদে বেশীদিন টিকতে পারেননি। হিটলারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার পতন ঘটে।

বাংলার ইতিহাস একটু অন্যরকম। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে সচেতন হলেও ওটাকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভাবতে অনেকে অভ্যস্ত। অতি অল্পসংখ্যক লোকই ভাবে যে, বিশ্বাসঘাতকতার বহু রূপ থাকতে পারে। একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-তা সে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা তমদ্দুনিক স্বাধীনতা হোক না কেন, যারা বিকিয়ে দিতে চায় তারাই বিশ্বাসঘাতক। দেশের প্রতি, নিজের সমাজের প্রতি তাদের আনুগত্য নেই।

এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার কারণ নানা প্রকারের। কেউ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আশায় বিদেশী শক্তিকে দেশে কায়েম করে তার ছত্রচ্ছায়ায় কৃত্রিম ক্ষমতা ভোগকে সত্যিকার স্বাধীনতা মনে করে। কেউ ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশী করে মুনাফা অর্জনের লোভে দেশ ও জাতিকে পরাধীন করতে দ্বিধা করে না। আবার কেউ ভূয়া আদর্শবাদের দোহাই দিয়ে নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বিসর্জন দিতে এগিয়ে আসে। এসবই বিশ্বাসঘাতকতা।

বিশ্বাসঘাতকতা বিভিন্ন রকমের ছদ্মবেশ ধারণ করে হাজির হয়- বিশেষতঃ আজকালকার যুগে। কারণ, মীরজাফর বা কুইজলিং-এর বিশ্বাসঘাতকতার মত স্থূল বিশ্বাসঘাতকতা আজকালও বিরল না হলেও তার আবেদন সংকুচিত হয়ে গেছে। বর্তমান যুগের বিশ্বাসঘাতকদের তাই সূক্ষ্ম ছদ্মবেশ ধারণ করে লোক সমক্ষে উপস্থিত হতে দেখা যায়। আদর্শবাদের ছদ্মবেশই এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। কারণ আদর্শবাদের পিছনে বিশ্বাসঘাতকতা লুকিয়ে থাকতে পারে। এ সন্দেহ সহজে কোনো মনে উদিত হয় না। যাঁরা এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত তাঁরা কস্মিনকালেও দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে কোন শব্দ উচ্চারণ করেন না। সমাজে তাঁরা দেশপ্রেমিক হিসাবে পরিচিত। কিন্তু তাঁরা অনবরত এমন সব কর্মে সমাজকে উৎসাহিত করছেন, যার অনিবার্য পরিণতি হবে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা লুপ্তি।

> সিরাজউদ্দৌলাকে স্মরণ তখনই অর্থবহ হবে যখন আমরা বাংলাদেশের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বর্তমানে দানা বেঁধে উঠছে, সে সম্বন্ধে আমরা সতর্ক হতে পারি। অনেক তরুণ যারা ভালো করে সমাজের ইতিহাস জানে না, তারা অজ্ঞাতসারে এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। তরুণরা স্বভাবতই আদর্শবাদী। তাদের আদর্শবাদিতার সুযোগ নিয়েই তাদের মনে অনেক বিশ্বাস সঞ্চার করা হচ্ছে, যার একমাত্র অর্থ হচ্ছে যে, বাংলাদেশের আলাদা কোন শিল্পকলা নেই। যাঁরা আবহমানকাল থেকে পূর্ব বাংলার জনসমাজকে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা করে এসেছেন, সে সমস্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের জাতীর বীর হিসাবে আমাদের সামনে দাঁড় করানো হচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে শুনছি যে, এঁরাই না-কি পূর্ব বাংলার সত্যিকারের মঙ্গলাকাংখী।

এ রকমের প্রচারণা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে যে, সমাজের তরুণদের মধ্যে ইতিহাস-চেতনা নেই, তারা অতীত সম্বন্ধে বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তি দূর না হওয়া পর্যন্ত সিরাজউদ্দৌলা দিবস উদযাপন সত্যিকার অর্থে সার্থক হবে না।

তবে অনেক দিন পর সিরাজউদ্দৌলাকে স্মরণ করার কথা মনে হয়েছে, এটা অবশ্যই একটা সুলক্ষণ। চল্লিশের দশকে যেমন তিনি লুপ্ত স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তেমনই আজও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতীকী তাৎপর্য নিঃশেষিত হয়নি। মীরজাফরের দলও নির্মূল হয়নি। দেশের, সমাজের স্বকীয়তা রক্ষা করতে হলে ১৭৫৭ সালের সেই দুর্যোগের কারণ এবং তার ভয়াবহ পরিণতির কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

সূত্রঃ পলাশী ট্রাজেডীর ২৪০তম বার্ষিকী স্মারক

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন মাগুরা জেলার আলোকদিয়া গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যে পণ্ডিত এবং লেখক। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইংরেজি সাহিত্যে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন নিজস্ব মেধার কারণেই সেই সময়কালের পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবেই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পর্যায়ের লেখাপড়া কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসের ছাত্র তখনই ঢাকায় গঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠিত হয় এবং তিনি এর চেয়্যারম্যান-এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এম.এ. ডিগ্রী করেন। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে প্রভাষক পদে যোগ দিয়ে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। এ সময় তিনি কলকাতার ইংরেজি কমরেড পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখতেন। "কমরেড" ছিল মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের ইংরেজি ভাষার মুখপত্র স্বরূপ। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হয় এবং সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনকে চেয়্যারম্যান নির্বাচন করা হয়। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি সিলেটের এম,সি, কলেজে বদলী হন এবং এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করেন।

তিনি ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র দু□বছরে গবেষণা কাজ শেষ করে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যে পিএইচডি ডিগ্রী কৃতিত্বের সাথে লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি বিশ বছর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক পদ থেকে অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান পর্যন্ত সকল পদে দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৭১-এর জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই পদে বদলি হন। ১৯৭১ সালের পর সামাজিক পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতা সহ্য করতে না পেরে তিনি দেশ ত্যাগ করেন এবং সৌদী আরবে শিক্ষকতা শুরু করেন। মক্কার উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজির অধ্যাপকের চাকুরী করতেন। ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য মক্কা থেকে পূর্ণ অবসর নিয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তিনি অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।